#আমি পদ্মজা পর্ব ৫২

_____
ফরিনা তাড়াহুড়ো করে খোশমেজাজে রান্না করছেন। সাহায্য করার মতো পাশে কেউ নেই। একাই দৌড়ে দৌড়ে সব করছেন। হাওলাদার বাড়িতে অতিথি এসে একদিন না থেকে যেতে পারে না। এতে নাকি গৃহস্থ বাড়ির অমঙ্গল হয়। তাই মজিদ লিখনকে থেকে যেতে জোর করেছেন। পদ্মজা নিজের ঘরে স্বামী সেবায় ব্যস্ত। আমিরের ঘাড়ের চামড়া ফুলে গেছে। হাড়ে বিষের মতো যন্ত্রণা। বিপুল ডাক্তার ঔষধপত্র দিয়েছেন। পদ্মজা অশ্রুসজল নয়নে আমিরের মুখের দিকে চেয়ে চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ স্বামীর যন্ত্রণা দেখেছে। সহ্য করতে হয়েছে। মাত্রই আমির চোখ বুজেছে। সে মনে মনে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করছে,দ্রুত যেন

আমিরের ব্যথাটা সেড়ে যায়। নয়তো তাকে যেন দিয়ে দেয়। ঘাড়ের আহত অংশে পদ্মজা আলতো করে ছুঁয়ে দেয়। নীল হয়ে আছে। লতিফা নিরবে পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াল। পদ্মজা কারো উপস্থিতি টের পেয়ে জলদি চোখের জল মুছল। তারপর লতিফাকে দেখে বলল,'লুতু বুবু!'
লতিফা বলল,'খাইবা না? খালাম্মা খাইতে ডাকতাছে।'
পদ্মজা গম্ভীরকণ্ঠে বলল,'আম্মা নিজের ছেলেকে কেন দেখতে আসেননি?'
'খালাম্মায় লিখন ভাইজানের লাইগে রাঁনতাছিল।'
পদ্মজা ক্ষিপ্ত হয়,'নিজের ছেলেকে না দেখে উনি কীভাবে অতিথির জন্য ভোজ আয়োজন করছেন? আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'
লতিফা নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পদ্মজা অনেকক্ষণ ক্ষিপ্ত নয়নে মেঝেতে চোখ নিবদ্ধ

করে রাখল। এরপর আমিরকে এক ঝলক দেখে, লতিফাকে বলল,'তুমি যাও,আমি আসছি।'
লতিফা দুই পা এগোতেই পদ্মজা ডেকে উঠল,'লুতু বুবু।'
লুতু দাঁড়াল। পদ্মজা বলল,'তুমি আমার উপর নজর রাখছিলে কেন? আর আমাকে না জিজ্ঞাসা করে থাপ্পড়ের কথাই বা কেন বলেছো উনাকে?'
লতিফার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। সে নত হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা আরো দুই বার প্রশ্ন করেও কোনো জবাব পেল না। তাই বলল,'নিষেধাজ্ঞা আছে নাকি?'
এইবার লতিফা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। সে কিছু একটা ভাবল। এরপর মুখ তুলে দেখল পদ্মজা তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। লতিফা অপ্রতিভ হয়ে উঠে। বলে,'আমি যাই। নইলে খালাম্মায় চেতব।'

পদ্মজার উত্তরের আশায় থাকেনি লতিফা। তড়িঘড়ি করে চলে যায়। পদ্মজা ভ্রুকুটি করে দরজার বাইরে তাকিয়ে থাকে। প্রতিটি প্রশ্ন যেন আলাদা আলাদা। অথচ তার মনে হয় সব প্রশ্নের এক উত্তর,এক যোগসূত্র। এখন সেসব ভাবার সময় না। আমিরের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত। পদ্মজা আমিরের কপাল ছুঁয়ে তাপমাত্রা অনুমান করে। ভীষণ গরম। জ্বর উঠছে নাকি!

লিখন,মৃদুলের আড্ডা জমে উঠেছে। দুজন জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। লিখনের নায়িকা তিন দিন আগে ঘাট থেকে পিছলে নদীতে পরে গেছে। সাঁতার জানে না তাই প্রচুর পানি খেয়েছে। সেই সাথে পা মচকে গেছে। কোমরেও ব্যথা পেয়েছে। এই কথা শুনে মৃদুল হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিল। পূর্ণা দূর থেকে কটমট করে মৃদুলের দিকে

তাকিয়ে আছে। কত অসভ্য এই লোক! মানুষের আঘাতের কথা শুনে হাসে! তার গা জ্বলে যাচ্ছে মৃদুলের হা হা করে হাসা দেখে। লিখন আরো জানাল,সে এবং তার দল গত তিনদিন নায়িকা ছাড়া দৃশ্যগুলোর শুটিং করেছে। বাকি যা দৃশ্য আছে সবকিছুতে নায়িকার উপস্থিতি থাকতেই হবে। তাই আপাতত শুটিং স্থগিত আছে। আশা করা যাচ্ছে, তিন-চার দিনের মধ্যে নায়িকা সুস্থ হয়ে যাবে। পূর্ণাকে দূরে বসে থাকতে দেখে লিখন ডাকল। পূর্ণা খুশিতে গদগদ হয়ে দৌড়ে আসে। ঘন্টা দুয়েক আগে একটু কথা হয়েছিল। আর হয়নি। লিখন প্রশ্ন করল,'ভেতরের অবস্থা কেমন? আমির হাওলাদার আগের চেয়ে কিছুটা ভালো অনুভব করছেন?'
'হু,ঘুমাচ্ছে দেখে এলাম। আপা আছে পাশে।'
'তোমার আপা পাশে থাকলে আর কী লাগে!' লিখনের কণ্ঠটা করুণ শোনায়। পূর্ণা প্রসঙ্গ

পাল্টে বলল,’ভাইয়া,আপনি কিন্তু আমাদের বাড়িতে যাবেন। তখন বললাম, কিছুই বললেন না।’
‘আচ্ছা,যাব।’
‘প্রান্ত অনেক খুশি হবে।’
‘প্রান্ত যেন কে?’
‘আমার ভাই। ওইযে খুন-
‘মনে পড়ছে। কী যেন নাম ছিল... মুন্না বা এরকম কিছু নাম ছিল না?’
‘জি ভাইয়া।’
‘সবাই কত বড় হয়ে গেছে। পড়াশোনা আর করোনি কেন?’
পূর্ণা বাম হাত চুলকাতে চুলকাতে বলল,’মেট্রিক ফেইল করাতে আর পড়তে ইচ্ছে করেনি।’
মৃদুল ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল,’তুমিও মেট্রিক ফেইল?’

পূর্ণা আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইল,’কেন? আরো কেউ আছে এখানে?’
মৃদুল মুচকি হেসে চুল ঠিক করতে করতে চমৎকার করে বলল,’আমিও মেট্রিক ফেইল।’

মৃদুলের কথা শুনে লিখন সশব্দে হেসে উঠল। পূর্ণা সরু চোখে তাকিয়ে আছে মৃদুলের দিকে। মজা করলো নাকি সত্য বলল? লিখন ঠোঁটে হাসি ধরে রেখে বলল,’মৃদুল মজা করছো নাকি সত্যি?’
মৃদুল গুরুতর ভঙ্গিতে বলল,’আচ্ছা,মিথ্যা কইতে যামু কেন? এতে আমার লাভডা কী?’

মৃদুলের ভঙ্গি দেখে লিখন চারপাশ কাঁপিয়ে হাসল। সাথে তাল মিলাল পূর্ণা ও মৃদুল। লিখন আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে। দেখতে কত ভালো দেখাচ্ছে। কী অপূর্ব মুখ। বলিষ্ঠ শরীর। পূর্ণা কেন জানি আজও মনে হচ্ছে,লিখনের পাশেই পদ্মজাকে মানায় বেশি। পরক্ষণেই

পূর্ণা নিজেকে শাসাল,'চুপ থাক পূর্ণা! আমির ভাইয়ার মতো ভালো মানুষ দুটি নেই। আপার জন্য উনি সেরা।'
তবুও মন বুঝে না। হয়তো সৌন্দর্যের মিলটার জন্যই লিখন,পদ্মজা দুটি নাম তার ভাবনায় একসাথে জোড়া লেগে যায়। অথচ,বিবেক দিয়ে ভাবলে মনে হয় আমিরের জায়গা কেউ নিতে পারবে না। কেউ না। সে অনন্য।

হাসিখুশি মুহূর্ত উবে যায় খলিলের কর্কশ কণ্ঠে,'বেহায়া,বেলাজা ছেড়ি। পর পুরুষের সামনে কেমনে দাঁত মেলায়া হাসতাছে। ঘরে বাপ মা না থাকলে এমনই হয়। এই ছেড়ি ঘরে যাও।'

লিখন,মৃদুলের সামনে এভাবে কটু কথা শুনে পূর্ণা বুক ফেটে কান্না আসে। সে এক পলকে লিখন,মৃদুলকে দেখে আলগ ঘরের ভেতর চলে যায়। লিখন,মৃদুল হতভম্ব। খলিলের

মাথায়,হাতে ব্যান্ডেজ। নাকের নিচে চামড়া উঠে গেছে,মাংস দেখা যাচ্ছে। তবুও তেজ কমে না। তিনি পূর্ণাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন,'মা ডা মইরা যাওয়ার পর থেকে এই ছেড়ি দস্যি হইয়া গেছে। এত বড় ছেড়ি,বুড়া হইতাছে। বড় বইনে বিয়া দেয় না। কোনদিন কোন কাম ঘটায় আল্লায় জানে। তা লিখন দুপুরের খাবার খাইছো?'

লিখনের ইচ্ছে হচ্ছে না এই কুৎসিত ভাবনার লোকটার জবাব দিতে। যেহেতু সে এই বাড়ির অতিথি। তাই মনের কথা শুনতে পারল না। বলল,'জি না।'

মৃদুল খলিলকে উপেক্ষা করে আলগ ঘরে ঢুকে পড়ে। পূর্ণা আলগ ঘরের পিছনের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মৃদুল পিছনে এসে দাঁড়াল। কোমল স্বরে বলল,'খালুর কথায় কষ্ট পাইছো?' পূর্ণা মৃদুলের দিকে না তাকিয়ে জবাব

দিল,’আপনি কারো কষ্টের কথা ভাবেন দেখে ভালো লাগলো।’
‘সবসময় ত্যাড়া কথা কেন কও? আমি যদি আগে জানতাম,তোমারে কালি কইলে তোমার এত্ত কষ্ট হয়। আমি কইতাম না।’

পূর্ণা তাকাল। পূর্ণার দৃষ্টি দেখে মৃদুলের মন কেমন করে উঠল। এ দৃষ্টির নাম বোধহয় ‘মন কেমন করা দৃষ্টি’। পূর্ণা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল,’মাফ চাইছেন?’
মৃদুলের জোড়া ভ্রু কুঁচকে আসে। দুই পা পিছিয়ে যেয়ে বলে,’জীবনেও না।’

পদ্মজা ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো রান্নাঘরে ঢুকে ফরিনাকে বলল,’আম্মা,কী হয়েছে আপনার?’
ফরিনা প্রবল বিস্ময়ে জানতে চাইলেন,’কেন? কী হইব আমার?’
ফরিনার ব্যবহারে পদ্মজা খুব অবাক। সে কিঞ্চিৎ হা হয়ে তাকিয়ে রইল। ফরিনা নিশ্চিন্ত

মনে চুলা থেকে পাতিল নামালেন। তারপর বললেন,'ও পদ্মজা,মগারে একটু কইবা লিখন,মৃদুলরে ডাইকা আনতে। লিখন ছেড়াডা কহন আইছে। এহনও খায় নাই।'
পদ্মজা আর ঘাঁটল না ফরিনাকে। সে বুঝে গেছে কোনো জবাব পাবে না। সদর ঘরে পার হতেই সদর দরজায় মৃদুল এবং লিখনের দেখা পেল। পদ্মজা চট করে আঁচল দিয়ে মাথা ঢেকে নিল। তারপর বলল,'আপনারা এখানে এসে বসুন। আম্মা,আপনাদেরই খোঁজ করছিলেন।'
কথা শেষ হতেই পদ্মজা সদর ঘর ছেড়ে রান্নাঘরে চলে গেল। লিখন আবিষ্ট হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। সেই পুরনো দিনের মতোই তার স্বপ্নের প্রেয়সী এক ছুটে পালিয়ে বেড়ায়। পার্থক্য শুধু এটাই,আগে লজ্জায় পালাত,এখন অস্বস্তিতে। লিখন গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পদ্মজাকে এক ঝলক দেখার

জন্য এই বাড়িতে সে পা দিয়েছে। যাকে ভালোবাসে তার স্বামীর বাড়িতে আসা কতটা কষ্টের তা শুধু তার মতো অভাগারাই জানে।
মৃদুল লিখনের দৃষ্টি খেয়াল করে কিছু একটা আন্দাজ করে বলল,'পদ্মজা ভাবিকে চিনেন?'
'চিনব না কেন-
লিখন থেমে গেল। সে নিজের অজান্তেই কী বলে দিচ্ছিল! হেসে বলল,' এতসব জেনে কী হবে? আসো গিয়ে বসি। তারপর বলো,কখনো প্রেমে পড়েছো?'
'না মনে হয়।' উদাসীন হয়ে বলল মৃদুল।
'নিশ্চিত হয়ে বলো।'
মৃদুল ভাবল। কোন নারীর প্রতি তার আকর্ষণ বেশি কাজ করেছে। উত্তর পেয়েও গেল। সকালেই সে পূর্ণার মধ্যে অদ্ভুত কিছু পেয়েছে। অজানা অনুভূতি অনুভব করেছে। এটা কী প্রেম? মৃদুল নিশ্চিত নয়। তাই সে বলল,'না,পড়ি নাই।'

‘আচ্ছা,সেসব বাদ। বিয়ে করছো কবে সেটা বলো।’
‘উমম,হুট করে একদিন। আমার ইচ্ছে,আমি হুট করে একদিন বিয়ে করে আস্মারে চমকে দেব।’
লিখন সশব্দে হাসল। বলল,’জানো মৃদুল,মানুষের সব চাওয়া পূরণ হয় না। প্রতিটি মানুষের জীবনের কোনো না কোনো পাশে অপূর্ণতা থাকে।’
‘তাহলে বলছেন,আমার এই ইচ্ছে পূরণ হইব না?’
‘না তা বলছি না। হুট করে বিয়ে করে ফেলা আর কেমন অসম্ভব কাজ? মেয়ে রাজি থাকলেই হলো। মেয়ে বেঁকে গেলে কিন্তু কিচ্ছা খতম।’
লিখন আবার সশব্দে হাসল। মৃদুলও অকারণে তাল মিলিয়ে হাসে আর ভাবে,একটা মানুষ

এতো হাসতে পারে কীভাবে? এতো সুখী লিখন শাহ?
সে তো আর জানে না দুঃখীরা পাহাড় সমান কষ্ট লুকোয় হাসির আড়ালে।

আস্তে আস্তে বাড়ির সবাই আসে। আমির ছাড়া। রিদওয়ান, খলিল এত শান্তভাবে আছে যে মনেই হচ্ছে না সকালে এতো বড় ঘটনা ঘটে গেছে। বাড়ির মহিলারা দৌড়ে দৌড়ে খাবার পরিবেশন করছে। পদ্মজা খুব অবাক হয়ে প্রতিটি মানুষকে পর্যবেক্ষণ করছে। লিখনও এতে কম অবাক হয়নি। কত শান্ত পরিবেশ! ঝগড়ার পর মান-অভিমান,তর্ক-বিতর্ক থাকে। সেসব কিছুই নেই। পদ্মজা সবার সামনে আলাদা প্লেটে খাবার নিয়ে ফরিনাকে বলল,'আম্মা,আমি উনার জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছি। ঘুম ভেঙেছে হয়তো।'

পদ্মজা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছে। লিখন সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে থাকে। পদ্মজার হাঁটার ছন্দ দৃপ্ত ও সাবলীল। মাথায় শাড়ির আঁচলে ঘোমটা টানা। স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছে। এই স্বামীটা কী সে হতে পারত না? এতোটাই অযোগ্য ছিল! অযোগ্য নাকি নিয়তির খেলা? কেন ভোলা যায় না এই নারীকে?

লিখনের বোন লিলি আর পদ্মজা একই ক্যাম্পাসের হওয়া সত্ত্বেও লিখন কখনো পদ্মজার সামনে এসে দাঁড়ায়নি। পদ্মজার অস্বস্তি হবে ভেবে। সে পদ্মজার চোখে ভালোবাসা দেখতে চায়,বিব্রতভাব বা অস্বস্তি দেখতে চায় না। এ যে বড় যন্ত্রণার। এতোদিনেও বুকের ভেতর কীভাবে পুষে আছে এক পাক্ষিক ভালোবাসা? কোনোভাবে কী এই ভালোবাসা পূর্ণতা পাবে! আসবে কী সেই সুদিন? লিখনের শুষ্ক চক্ষু সজল হয়ে উঠে। সে

ভাবতে পারে না, পদ্মজা বিবাহিত! লিখনের সম্মুখ বরাবর মৃদুল ছিল। মৃদুল লিখনের প্রতিক্রিয়া দেখে অনেক কিছুই বুঝে নিল। নিশ্চিত হওয়া যাবে পূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করলে। খাওয়াদাওয়া শেষ করে পূর্ণার সাথে কথা বলতে হবে। মৃদুল চারিদিকে চোখ বুলিয়ে পূর্ণাকে খোঁজে।

পদ্মজা আমিরকে ধরে ধরে বসাল। ঘাড়ে প্রচন্ড ব্যথা। টিকে থাকা যাচ্ছে না। রাগে কিড়মিড় করছে এখনও। পদ্মজা শান্ত করে। তারপর খাইয়ে দিল। খাওয়া শেষে আমির ম্লান হেসে বলল,'লিখনের সাথে কথা হয়েছে?'
পদ্মজা নিষকম্প স্থির চোখে তাকাল,'উনার সাথে কেন কথা হতে যাবে আমার?'
'উনি তো তোমার জন্যই এসেছেন।'
'আপনাকে বলেছে? অন্য দরকারেও আসতে পারে।'

আমির হাসল। বলল,’সে আজও তোমাকে পছন্দ করে। আশা করে তুমি তার কাছে যাবে।’
‘অসম্ভব। যা তা বলছেন। আপনি এসব বললে আমার খারাপ লাগে।’
পদ্মজা থামল। আমির মৃদু হাসছে। পদ্মজা আমিরের কোলে মাথা রেখে আদুরে কণ্ঠে বলল,’আপনি জানেন না আপনাকে কত ভালোবাসি আমি। আমি আপনাকে ছাড়া এক মুহূর্তও ভাবতে পারি না।’
‘তাহলে বাচ্চার জন্য বিয়ে করতে বলো কেন?’
‘বন্ধ্যা নারীর কত যন্ত্রণা বুঝবেন না।’
‘ আমাদের একটা মেয়ে হয়েছিল।’
‘আর হবে না,তাই বলি।’
‘হবে,আল্লাহ চাইলে হবে। তাছাড়া আমার কাছে তো ফুটফুটে একটা বউই আছে। আর কী লাগে?’

পদ্মজা আমিরের কোল থেকে মাথা তুলে বসে। তারপর চিরুনি দিয়ে আমিরের চুল আঁচড়ে দিয়ে বলল,'চুলগুলো বড় হয়েছে অনেক।'
'হু,আচ্ছা এদিকে আসো।'
আমির পদ্মজাকে এক হাতে টান দিতে গিয়ে ঘাড়ে চাপ খেয়ে 'আহ' করে উঠল। পদ্মজা ব্যস্ত হয়ে পড়ে,'খুব লেগেছে? আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। কেন এমন করেন আপনি!'

চারপাশ অনেকটা ফর্সা হয়েছে। দুপুরের সূর্যটা একটু দেখা যাচ্ছে। তাও তেজ নেই। কিছুক্ষণ পর আবার ডুবেও যাবে। পূর্ণা লবণ দিয়ে টক বড়ই খাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে,অমৃত খাচ্ছে। মৃদুল পূর্ণার পাশে এসে বসল।পূর্ণা চমকে উঠে। মৃদুলকে দেখে বুকে থুথু দেয়। তারপর বাজখাঁই কণ্ঠে বলল,'হুট করে এভাবে কেউ আসে?'

‘আর কথা কইও না। তোমারে সারা দুনিয়া খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেছি। মাত্র মগা কইল,তুমি নাকি ছাদে।’
‘কেন? আমাকে খুঁজছেন কেন?’
‘এমনে খ্যাঁট খ্যাঁট কইরা কথা কইতাছ কেন? একটু ভালো কথা আহে না মুখ দিয়ে?’
পূর্ণা একটু নড়েচড়ে বসল। তারপর হেসে বলল,’দুঃখিত। এবার বলুন কী দরকার।’
‘ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতাম আর কী!’
‘আমার ব্যক্তিগত কোনো তথ্য নেই।’
‘তোমার না,তোমার বড় বইনের। পদ্মজা ভাবির।’
পূর্ণা উৎসুক হয়ে তাকাল। মৃদুল উশখুশ করতে করতে বলল,’পদ্মজা ভাবি আর লিখন ভাইয়ের মধ্যে কী কোনো সম্পর্ক ছিল?’
পূর্ণা জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ল। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে,মৃদুল কোনো ফালতু প্রশ্ন করেছে।

এরপর নির্বিকার কণ্ঠে বলল,’না। তবে,লিখন ভাই আপারে পছন্দ করতো। আপার সাথে ভাইয়ার বিয়েটা কেমনে হইছে জানেন?’
‘আমির ভাইয়ের কথা বলছো?’
‘আমার আপার কী আর কোথাও বিয়ে হয়েছে?’
‘সোজা উত্তর দিতে পারো না? তারপর বলো।’
‘ওই ঘটনাটা না হলে হয়তো লিখন ভাইয়ের সাথেই আপার বিয়েটা হতো। কিন্তু হয়নি। এতটুকুই।’
‘লিখন ভাইরে দেখলে মনে হয়,তাদের মধ্যে কোনো গভীর সম্পর্ক ছিল। তারপর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। ভাই অনেক ভালোবাসতে পারে।’
‘হু।’ পূর্ণা বড়ই খাচ্ছে তৃপ্তি করে।

মৃদুল বিরক্তি নিয়ে অনেকক্ষণ পূর্ণার দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর উঠে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। চারপাশ দেখে। পূর্ণা বাঁকা চোখে মৃদুলকে পা

থেকে মাথা পর্যন্ত পরখ করে নেয়। মৃদুলের উপস্থিতি তার হৃদ স্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করে। কিন্তু তা প্রকাশ করার সাহস হয় না। পূর্ণা আরেকটা বড়ই হাতে নিল। তখন মৃদুল ডাকল,'বেয়াইন।'

পূর্ণা তাকায়। মৃদুল ঝুঁকে ছাদের মেঝেতে কিছু দেখছে। পূর্ণা উৎসুক হয়ে সেদিকে এগিয়ে যায়। মৃদুল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল,'রক্ত না?'

পূর্ণা মৃদুলের মতো ঝুঁকে ভালো করে খেয়াল করল। তারপর বিস্ফোরিত কণ্ঠে বলল,'তাই তো।'
'মানুষের রক্ত না পশুর রক্ত নিশ্চিত হইতাম কেমনে?'
'পশুর রক্ত এইখানে আসবে কেন?'
'মানুষের রক্তই কেন আসবে?'
'তাই তো।'

দুইজন চিন্তিত হয়ে ভাবতে থাকল। পূর্ণা বলল,'মনে হয় কোনো পাখি শিকার হয়েছে। আর রক্তাক্ত অবস্থায় এখানে এসে পড়েছে।'
'তাহলে মরা পাখিটা কই?'
'ধরুন,আহত হয়েছে কিন্তু মরেনি। এরপর চলে গেছে।'

সন্ধ্যারাত। জোনাকিপোকারা ছুটে বেড়াচ্ছে। ঠান্ডা বাতাস। সেই বাতাসে পাতলা শার্ট পরে লিখন নারিকেল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। জোনাকি পোকা দেখছে। মাঝেমধ্যে অন্দরমহলের দিকে তাকিয়ে কাউকে চোখ দুটি খুঁজছে। সেদিন হেমলতা ফিরিয়ে দেয়ার পর সারা রাত বাড়ি ফেরেনি সে। ক্ষেতে বসেছিল। আকাশ কাঁপিয়ে কেঁদেছে। কেউ শুনেনি। স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মতো কষ্ট দুটো নেই। স্বপ্নে সাজানো সংসার ভেঙে চুরমার হওয়ার দিন ছিল সেদিন। এক সময় ইচ্ছে

হয়েছিল পদ্মজাকে তুলে নিয়ে পালাতে। কিন্তু বিবেক সাড়া দেয়নি। পরদিন সকালে উঠেই মা-বাবাকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। প্রতিটা মুহূর্তে আফসোস হয়,শুরুতে কেন হেমলতার কাছে প্রস্তাব দিতে পারল না সে! পরবর্তী কয়েকটা মাস ঘোরের মধ্যে কেটেছে। সিনেমা জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। এরপর জীবনের গতিটা স্বাভাবিক হয়েছে ঠিকই কিন্তু মন...মন তো ভেঙে গুড়িয়ে গেছে। আজও জোড়া লাগেনি। পদ্মজা কী কখনো জানবে,ঢাকায় কতবার পদ্মজার পিছু নিয়েছে সে। জানবে কী তার ভালোবাসার গভীরতা? লিখন আনমনে হেসে উঠল। চোখে জল ঠোঁটে হাসি! এ হাসি সুখের নয়,যন্ত্রণার।

পূর্ণা অন্দরমহলে আসেনি। পদ্মজা ভীষণ রেগে আছে। আলগ ঘরের বারান্দায় সারাক্ষণ কী করে এই মেয়ে? এর আগেও যখন পারিজা

তার পেটে ছিল। পূর্ণা এই বাড়িতে অনেকদিন ছিল। তখনও মাঝ রাত অবধি আলগ ঘরের বারান্দায় বসে থাকত। পদ্মজা শাল গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে আসে অন্দরমহল থেকে। সারাদিন পূর্ণার খোঁজ নেয়া হয়নি। এখন ধরে ঘরে নিয়ে যাবে। নির্জন,থমথমে পরিবেশ। তখন লিখনের কণ্ঠ ভেসে আসে,'পদ্মজা?'

পদ্মজা কণ্ঠটি শোনামাত্র ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠে। অপ্রতিভ হয়ে উঠে। একটা মানুষ কেন তাকে এত বছর মনে রাখবে? কেন অনুচিত আশা করে বসে থাকবে! পদ্মজার রাগ হয়,অস্বস্তি হয়। কষ্টও হয়। প্রার্থনা করে, এই মানুষটার জীবনে কেউ আসুক। এসে তার জীবনটা কানায় কানায় পূর্ণ করে দিক। ভুলিয়ে দিক অতীত। পদ্মজা স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,'এভাবে রাতের বেলা ডাকবেন না।'

পদ্মজা লিখনকে উপেক্ষা করে দুই পা এগিয়ে যায়।

‘জীবন থেকে তো সরেই গিয়েছো। আমি তোমাকে বিব্রত করতে চাই না। তাই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সামনে আসিনি। আজ যখন এসেই পড়েছি কয়েক হাত দূরে থেকেই একটু কথা বললে কী খুব বড় দোষ হয়ে যাবে?’

লিখনের করুণ কণ্ঠ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে পদ্মজা। লিখন হাসল। সুরগুলি যেন ফিরে এসে প্রাণে মৃদুগুঞ্জন শুরু করে দিয়েছে। পদ্মজার উপস্থিতি এভাবে কাঁপন ধরাচ্ছে কেন! আজকের এই সময়টা সুন্দর, ভারি সুন্দর!

চলবে...